অটিস্টিক শিশুদের কেয়ার-গিভারদের জন্য সাইকোএডুকেশন

জেসমিন আরা

অটিজম এমন একটি রোগ যার কিছু লক্ষণ সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। ডায়াবেটিসের মতো কিছু শারীরিক রোগের লক্ষণগুলোও সারা জীবন ধরে দেখা যায়। সাধারণত অটিজম জন্মের পর থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এর ফলে মূল যে সমস্যাগুলো দেখা যায় তা হলো: অন্যের সাথে যোগাযোগে সমস্যা, সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে সমস্যা, ভাষার বিকাশ কম হওয়া, কোন বস্তুর প্রতি অনাবশ্যক আগ্রহ এবং পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। অটিজম মৃদু থেকে তীব্র মাত্রার হতে পারে এবং এর লক্ষণগুলো এক-এক শিশুর মধ্যে এক-একরকমভাবে দেখা যায়।

লক্ষণ

অটিস্টিক শিশুদের দ্রুত চিহ্নিত করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে ২৩ থেকে ৩৬ মাসের শিশুর মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখা যায় যা দেখে সহজেই অটিস্টিক শিশুকে সনাক্ত করা যায়। লক্ষণগুলো হলো:

- প্রথম ১২ মাসের মধ্যে শিশু আধো-আধো কথা বলে না।
- কোন ইশারা/ইঙ্গিত করে না (আঙ্গুল দিয়ে কোন কিছু দেখানো, হাত নেড়ে টাটা-বাইবাই করা ইত্যাদি)।
- প্রথম ১৬ মাসের মধ্যে একটি করে শব্দ বলার চেষ্টা করে না।
- প্রথম ২৪ মাসের মধ্যে দুটি শব্দ দিয়ে (শুধু অনুকরণ করে নয়) নিজের থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলে না।
- তিন বছর বয়সের মধ্যে শিশুর বিকাশের বিভিন্ন লক্ষতাগুলি ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। যেমন নাম ধরে ডাকলে ফিরে তাকানো, হাসা, কথা বলা ইত্যাদি।
- জেদি আচরণ করে এবং অতিমাত্রায় চাঞ্চল্য দেখা যায়।

স্বাভাবিক শিশুদের কারও-কারও মধ্যে এসব লক্ষণের ২/১টি দেখা যেতে পারে। তবে যদি কোন শিশুর মধ্যে এসব লক্ষণের বেশির ভাগ দেখা যায় তাহলে দেরি না করে চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট

শিশুর অটিজম হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে বলতে পারেন একজন মনোচিকিৎসক, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষক। নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলো দেখে অটিস্টিক শিশুদের চিহ্নিত করা যায়:

১। সামাজিক আচরণের ধরন

স্বাভাবিক শিশুরা জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচরণ করতে শুরু করে, যেমন নাম ধরে ডাকলে ফিরে তাকায়, আদর করলে হাসে, সমবয়সী শিশুর সাথে খেলা করে ইত্যাদি। অন্যদিকে, অধিকাংশ অটিস্টিক শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক সামাজিক আচরণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। যেমন--

১. নাম ধরে ডাকলে ফিরে তাকায় না।

২. সমবয়সী শিশুর সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারে না। যেমন একই সাথে খেলা করা, গল্প করা ইত্যাদি।

৩. মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকায় না।

৪. অন্যরা আদর করলে কিংবা জড়িয়ে ধরলে প্রায়ই অপছন্দ করে বা ভালো বোধ করে না।

৫. কল্পনামূলক বা অভিনয়মূলক খেলা খেলে না, যেমন পুতুলের বিয়ে দেওয়া, যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা ইত্যাদি।

৬. অন্যের চিন্তা ও অনুভূতি বুঝতে শেখে ধীরে ধীরে। অনেকে এটা বুঝতেই পারে না।

৭. বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে না। যেমন বিয়ে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করা, জেদ করা ইত্যাদি।

খুবই সাধারণ সামাজিক বিষয় যেমন হাসি, তামাশা, চোখের ইশারা, ভাব-ভঙ্গি বা ভেংচি কাটা ইত্যাদি তাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়। একারণে তারা একই শব্দের বা বাক্যের বিভিন্ন অর্থ ধরতে পারে না, যেমন ওদের কাছে "চুপ করো" কথাটি সবসময় একই অর্থ বহন করে, এটা হাসি-হাসি মুখে বলা হোক বা রাগের ভঙ্গিতে বলা হোক, তাতে কিছু পার্থক্য হয় না।

২। ভাষার বিকাশ

স্বাভাবিক শিশুরা তিন বছর বয়সের মধ্যেই ভালোভাবে কথা বলতে শুরু করে। গবেষণায় দেখা গেছে, অর্ধেকেরও বেশি অটিস্টিক শিশু সারা জীবনে কথাই বলে না। আর যেসব শিশুর মধ্যে প্রথমে অটিজমের লক্ষণ দেখা যায় না, সেসব শিশু তিন বছর বয়সের মধ্যে বিভিন্নভাবে আধো-আধো কথা বলা শুরু করে, কিন্তু তারপর হঠাৎ করে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আবার অনেক শিশু কথা বলে অনেক দেরিতে; প্রায় ৫-৮ বছর বয়সের পর গিয়েও কথা বলতে দেখা যায়।

যেসব শিশুরা কথা বলে তাদের মধ্যে অনেকের ভাষা কিংবা শব্দ ব্যবহারেও বেশ অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। কেউ কেউ যথাযথ শব্দ জুড়তে পারে না, ফলে বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে, যা পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্যরা বুঝতে পারে না।

- কিছু শিশু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হয়তো সারাদিন একই ধরনের বাক্য ব্যবহার করে। যেমন "গাড়িতে ওঠ", "এখানে বস" ইত্যাদি।
- আবার ভাষার দক্ষতা ভালো থাকার পরও অনেক শিশু বেশিসময় কথা চালিয়ে যেতে পারে না।
- সাধারণ মানুষ আনন্দময় কথা বলতে গিয়ে হাসে বা বিভিন্ন ধরনের মুখভঙ্গি করে। কিন্তু এই শিশুদের মুখভঙ্গি, দেহভঙ্গি, চলাফেরার সাথে এদের অনুভূতির সচরাচর কোন মিল থাকে না। ওদের কণ্ঠস্বরেও মনের অনুভূতি যথাযথভাবে প্রকাশ পায় না।

* এসব শিশুদের অনেকেই যথাযথভাবে ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। তাই তাদের মনের অনুভূতি ও চাহিদা অন্যের কাছে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। ফলে অনেক সময় প্রত্যাশিত কোন জিনিস পাওয়ার জন্য তারা জেদি আচরণ করা শুরু করে।

এই সমস্যাগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ। যথাযথ প্রশিক্ষণ না পেলে এসব শিশু হয়তো সারাজীবন এটুকুই ভাষা ব্যবহার করবে।

৩। একই আচরণ বারবার করা

* কোন বস্তুর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া বা অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখানো। যেমন সুতা, চামচ, কাঠি, গাড়ি ইত্যাদি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাখা।
* কোন রুটিন কাজ বা পরিবেশের কোন পরিবর্তন করতে চাইলে সহজে মেনে না নেওয়া। অর্থাৎ সবসময় আশেপাশের জিনিস একইরকমভাবে থাকতে হবে। যেমন ঘরের কোন জিনিসপত্র সরানো হলে কান্নাকাটি শুরু করা।
* খেলনা বা জিনিসপত্র সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা।
* বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বারবার করা। যেমন আঙ্গুল মটকানো, হাত ঘষা, সারা শরীর মচকানো ইত্যাদি।
* সাধারণ কোন কাজের প্রতি বেশিক্ষণ মনোযোগ না দেওয়া।

৪। উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়া

* কোন কোন উদ্দীপকের প্রতি অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া করা। যেমন কেউ কেউ হয়তো টিভির শব্দ শুনলে বা কল দিয়ে পানি পড়ার শব্দে কানে হাত দিয়ে রাখে অথবা ঐ শব্দ কোথায় হচ্ছে তা খুঁজতে থাকে। আবার কেউ কেউ এই শব্দ বারবার শুনতে চাইবে।
* কোন ব্যথা বা যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির প্রতি কম প্রতিক্রিয়া করা বা অনুভূতি কম হওয়া। যেমন শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে সহজে ব্যথা প্রকাশ না করা।
* নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা। যেমন হাত কামড়ানো, দেয়ালে মাথা ঠুকা ইত্যাদি।

উপরোক্ত লক্ষণগুলো প্রধানত অটিজম হওয়ার পর শিশুর মধ্যে দেখা যায়। তবে এই লক্ষণগুলো এক-এক শিশুর ক্ষেত্রে এক-এক রকম হতে পারে; কারও মধ্যে বেশি মাত্রায় এবং কারও মধ্যে কম মাত্রায় দেখা যেতে পারে।

অটিজম প্রতিবন্ধকতা কেন হয়?

গবেষণায় দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের গঠন বা মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর অস্বাভাবিকতাই অটিজম হওয়ার কারণ। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতা কেন হয় তার সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে জন্মের পর কোন কারণে এটি সৃষ্টি হয় না। নিচে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো:

১. জন্মের সময় শিশুর দেহের ক্রোমোজমের কোনটিতে সমস্যা তৈরি হলে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যমজদের মধ্যে ভিন্ন যমজদের তুলনায় অভিন্ন যমজদের মধ্যে অটিজম হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে (Kates WR. Et al, 2004)।

২. গর্ভকালীন সময়ে, বিশেষ করে গর্ভের প্রথম তিন মাসে, মা রুবেলা (একে জার্মান হামও বলা হয়) ভাইরাসে আক্রান্ত হলে, শিশুর পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হতে পারে, যেমন অটিজমে আক্রান্ত হওয়া এবং মানসিক প্রতিবন্ধ ইত্যাদি।

৩. গর্ভকালীন সময়ে শিশুর অক্সিজেন সরবরাহ কম হলে অটিজম হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

৪. গর্ভকালীন সময়ে মানুষের মস্তিষ্ক দ্রুত বড় ও জটিল হতে থাকে। এসময়ে মস্তিষ্কের বিকাশ স্বাভাবিকভাবে না হওয়ার কারণে, শিশুর ভাষা, সংবেদন, সামাজিক ও মানসিক বিকাশে সমস্যা তৈরি হয়।

৫. মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণের ত্রুটির জন্য মস্তিষ্কের নিউরোকেমিক্যাল উপাদানের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়, ফলে এই রোগের লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে।

৬. আরও কিছু কারণের কথা বলা হয়, যেমন এমএমআর ভ্যাকসিন, খাবারে গ্লুটেন অথবা ক্যাসিন ইত্যাদি।

অটিজম কতোটুকু নিরাময়যোগ্য

অটিজমের নির্দিষ্ট কারণ কোনটি তা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। তাই এখন পর্যন্ত এমন কোন চিকিৎসাপদ্ধতি নেই যার মাধ্যমে শিশু সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়ে যাবে। পরিবারে প্রথম যখন কোন শিশুর অটিজম হয়েছে বলে সনাক্ত করা হয় তখন যে সমস্যাটা দেখা যায় তা হচ্ছে, বেশিরভাগ বাবা-মা এবং পরিবার এটা মেনে নিতে চায় না। বস্তুত, অনেক সময় পরিবারের সদস্যরা এমন বলে যে বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবে, বাচ্চাদের মধ্যে এধরনের আচরণ থাকতেই পারে ইত্যাদি। এসব ধারণার মাধ্যমে বাবা-মা কেবলমাত্র নিজেদের মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন এবং ফলশ্রুতিতে:

১. শিশুর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ হয় না।

২. শিশুর উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

তাই চিকিৎসা যত দেরিতে শুরু করবেন শিশুর পরিবর্তন ততই ধীর গতিতে হবে। অবশ্যই মনে রাখবেন, শিশুর অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, রুটিনমাফিক কাজ করা এবং সময় ও ধৈর্যের সমন্বয়। এজন্য প্রথম থেকেই যা দরকার তা হচ্ছে শিশুর বর্তমান পরিস্থিতিকে মেনে নেয়া এবং শিশুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো মূল্যায়ন করে তা উন্নয়নের পথ সুগম করা।

চিকিৎসা

যদিও অটিজমের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কৌশল আয়ত্ব করা। অটিজম সনাক্তকরণ এবং এর তীব্রতা বোঝার জন্য বিভিন্ন ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপক ব্যবহার করা হয়, যেমন ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule), ADCL (Autism Diagnostic Check List), PDDAS (Pervasive Developmental Disorder Assessment Scale). এই পরিমাপকগুলো ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শিশু ও মাতৃসদন হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এসব শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিক্ষা এবং থেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. ঔষধ

২. সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষা

৩. মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা (আচরণ পরিমার্জন ও সাইকোএডুকেশন)

৪. Speech Terapy (স্পিচ থেরাপি)
৫. Occupational Therapy (অকুপেশনাল থেরাপি)
৬. Physio Therapy (ফিজিওথেরাপি)

ঔষধ

কোন কোন শিশুর মধ্যে বেশ কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যেমন আক্রমণাত্মক আচরণ, ভাংচুর, অস্থিরতা, অতিচাঞ্চল্য, ঘুমের সমস্যা, মনোযোগের সমস্যা ইত্যাদি। এগুলো চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু ঔষধ রয়েছে যা ব্যবহার করলে শিশুকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তবে এসব ঔষধের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে। শিশুকে যে লক্ষণগুলোর জন্য ঔষধ দেওয়া হচ্ছে সেই লক্ষণগুলোর উন্নতি হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখুন। শিশুকে কতদিন ঔষধ ব্যবহার করতে হবে এবং কখন ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে তা সঠিকভাবে বলতে পারেন একজন চিকিৎসক। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজ থেকে ঔষধ বন্ধ করবেন না।

সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষা

শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকলে এবং কম মাত্রায় অটিজম থাকলে সাধারণ শিক্ষা লাভ করতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাধারণ স্কুলগুলোতে ভর্তি হলেও, পরবর্তীতে আচরণগত সমস্যা (চিৎকার করা, অতিচাঞ্চল্য, জেদি আচরণ ইত্যাদি) এবং জটিল বিষয় (অংক, বিজ্ঞান) বুঝতে না পারার কারণে কিছুদিন যেতে না যেতেই এসব শিশু বাদ পড়ে যায়। এসব পরিস্থিতিতে শিশুর সমস্যা আরো বেড়ে যায়। এরকম অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে শিশুকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী একটি বিশেষ স্কুলে দিন। বিশেষ স্কুলে শিশুর যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী এবং শিশুর উপযোগী শিক্ষার উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ স্কুলে প্রতিজনে একজন করে (ওয়ান টু ওয়ান) বা খুব ছোট দল করে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে করে শিশুর নিজের শেখার চাহিদা পূরণ হয়।

এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে:

১. প্রতিদিন ৩-৫ ঘন্টা (সপ্তাহে ২০-৩০ ঘন্টা) সময় ধরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করুন, যেখানে শিশুকে শিক্ষামূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করাবেন এবং তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন (বাসা এবং স্কুল মিলিয়ে)।

২. রুটিন অনুযায়ী অনুশীলন/চর্চা করান।

৩. নিয়মিত অনুশীলন করান। কারণ অনুশীলন নিয়মিত না হলে নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে না।

মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

মনোবিজ্ঞানীর নিকট আসার পর প্রথমে শিশু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নেওয়া হয়, যেমন শারীরিক, মানসিক, চিন্তাগত, পরিবেশ, বাসস্থান ইত্যাদি। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুর আচরণে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয় এবং বাবা-মাকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

স্পিচ থেরাপি

শ্রবণ সমস্যা, ভাষাগত সমস্যা এবং বাকপ্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ পায় স্পিচ থেরাপিস্টরা। এক্ষেত্রে শিশু কী পরিমাণ কথা বলছে এবং তাদের ভাষার দক্ষতা কতটুকু তা মূল্যায়ন করে দেখা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

অকুপেশনাল থেরাপি

যেসব শিশু কোন কোন উদ্দীপকের প্রতি অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া করে এবং যাদের সূক্ষ্ম মাংসপেশির দক্ষতার অভাব রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অকুপেশনাল থেরাপি কার্যকর।

ফিজিওথেরাপি

শিশুর বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশির দক্ষতার সমস্যা থাকলে (যেমন সিঁড়িতে উঠানামা, হাঁটা এবং বসায় অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি) তা সমাধানের জন্য ফিজিওথেরাপিস্টরা বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেন।

মনোবিজ্ঞানী, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, স্পিচ থেরাপিষ্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট -- এদের মধ্যে যে কোন বিশেষজ্ঞের নিকট আসার পর প্রথমে শিশুর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নেয়া হয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সমস্যার তালিকা তৈরি করা হয় এবং প্রতিটি সমস্যার বিপরীতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হয়।

শিশুকে সাহায্য করার কৌশলসমূহ

ক) কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা: অনেক ধরনের বিষয় রয়েছে যেগুলো আয়ত্ব করা অটিস্টিক শিশুদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শিশুর বয়সোপযোগী কী কী কাজ শেখা দরকার তা পরিকল্পনা করুন এবং সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিন। সব অটিস্টিক শিশুই এই পদ্ধতিতে উপকৃত হয়।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট:

- প্রতিটি কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করুন।
- কোন একটি সম্পূর্ণ কাজের ক্ষুদ্র ১টি অংশ শেখান এবং আস্তে আস্তে শেখান।
- একটি কাজের কিছু অংশ সম্পূর্ণভাবে শেখা হলে পরবর্তী অংশ শেখান ।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করুন এবং আস্তে আস্তে তা সরিয়ে নিন।

শিশুর যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতি ব্যবহার করুন। যেমন দাঁত ব্রাশ করার জন্য শিশুকে নিম্নোক্তভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়:

১. প্রথমে ব্রাশ রাখার হোল্ডার থেকে ব্রাশ নেয়া
২. কল খোলা
৩. ব্রাশ ধোয়া
৪. কল বন্ধ করা
৫. টুথপেস্ট নেয়া
৬. পরিমাণমতো টুথপেস্ট ব্রাশে লাগানো
৭. দাঁতে টুথব্রাশ দেওয়া ও বিভিন্ন অংশে ঘষা
৮. বেসিনে টুথপেস্টের ফেনা ফেলা
৯. টুথব্রাশ ধোয়া
১০. পানি দিয়ে কুলি করা
১১. মুখ মোছার জন্য তোয়ালে নেয়া
১২. মুখ মোছা এবং তোয়ালে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা

শিশুকে সাহায্য করার মাধ্যমে এই কাজগুলো শেখানো যায়। এক্ষেত্রে প্রথম দিকের কাজগুলোতে সাহায্য করুন এবং শেষের কাজটি শিশুকে নিজে নিজে করতে দিন। যেমন "মুখ মোছার পর তোয়ালে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা"।

আবার এটি বিপরীতভাবেও করা যায়। এক্ষেত্রে প্রথম কাজটি শিশুকে নিজে নিজে করতে দিন, যেমন "প্রথমে হোল্ডার থেকে ব্রাশ নেয়া" আর পরের কাজগুলোতে সাহায্য করুন। প্রতিটি কাজ শেষ করার পর পুরস্কার দিন ও প্রশংসা করুন।

খ) আচরণ ঘটার ধারাবাহিকতা: সাধারণত এই শিশুরা বিভিন্ন ধরনের জেদি আচরণ করে। যেমন অতিরিক্ত চিৎকার, কান্নাকাটি, কোন কাজ থেকে উঠে যাওয়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রথম কাজ হলো কোন ধরনের পরিস্থিতিতে শিশু এধরনের আচরণ করছে এবং আচরণের পরবর্তী ফলাফল কী হচ্ছে সেটা লক্ষ করা। এই আচরণ ঘটার ধারাবাহিকতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

এক্ষেত্রে শিশু বুঝল, যদি সে জেদ করে তাহলে তাকে মনোযোগ দেয়া হবে। এটি তার জন্য এক ধরনের পুরস্কার। এর ফলে, পরবর্তীতে শিশু কোন কিছু পাবার জন্য অথবা কোন কিছু করতে না চাইলে এই ধরনের আচরণ বারবার করতে পারে। তাই এই তিনটি ধাপের এক বা একাধিক ধাপে পরিবর্তন এনে শিশুর আচরণ পরিবর্তন করা যায়।

শিশু বিভিন্ন কারণে এই ধরনের আচরণ করে। যেমন একঘেয়েমি বোধ করলে, মনোযোগ পাওয়ার জন্য, কঠিন কাজ করতে ভয় পেলে, পরিবেশ বিরক্তকর হলে ইত্যাদি। এমন অবস্থায়:

১. যদি শিশু একঘেয়েমি বোধ করে বা পরিবেশটা বিরক্তিকর হয় তাহলে শিশুকে আনন্দদায়ক কোন কাজে যুক্ত করুন।

২. যদি শিশু মনোযোগ চায় তাহলে যখন সে ভালো অনুভব করে এবং ভালো কাজ করে তখন তার প্রতি মনোযোগ দিন।

৩. অত কঠিন কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে ভাগ করে শেখান।

এভাবেই শিশুর অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকদিন পর্যন্ত তিনটি ধাপে [ঘটনা-আচরণ-ফলাফল] ছক তৈরি করলে বোঝা যাবে শিশুটি কেন এবং কীসের জন্য এই আচরণ করছে। আচরণ পরিবর্তনের জন্য শিশুকে সাহায্য করুন এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞকে এই অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার কারণ উল্লেখ করে পরামর্শ নিন।

গ) দৈনন্দিন কার্যাবলী: শিশুর জন্য অবশ্যই দৈনন্দিন কার্যাবলীর একটি রুটিন তৈরি করুন। এমন রুটিন তৈরি করুন যা শিশুকে অলস করে ফেলবে না, আবার অতিরিক্ত চাপেও ফেলবে না। কোন কাজ শেখানোর ক্ষেত্রে তা ধীরে ধীরে শেখান, যেমন জামার বোতাম লাগানো, খাওয়া, কোন কিছু চুষে খাওয়া ইত্যাদি। সহজ কাজ দিয়ে শুরু করুন। আস্তে আস্তে কঠিন কাজের দিকে যান। কাজ ঠিকভাবে করার জন্য অথবা কাজ ভুল হলে তা সংশোধন করার জন্য:

- অনুরোধ করুন বা নির্দেশনা দিন। যেমন "চেয়ারে বস"।
- শিশুকে চিত্র দেখিয়ে কোন কিছু চিনতে সাহায্য করুন।
- শিশুর হাত ধরে কাজটি শিখতে সাহায্য করুন। যেমন হাত ধরে জামার বোতাম লাগানো।
- যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তার উপর জোর দিন।
- নির্দেশনা সবসময় সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে দিন। যেমন "দুটি বল" মিল করতে বললে শুধুমাত্র "মিল কর" নির্দেশ দিন ।

এক্ষেত্রে শিশুকে সাহায্য করুন। তারপর সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিন, এবং সেটা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করুন। এর ফলে শিশু অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে তার প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। প্রতিটি কাজ শেষ করার পর পুরস্কার দিন ও প্রশংসা করুন।

ঘ) পুরস্কারের ভূমিকা: শিশুর দৈনন্দিন কাজের উন্নতির জন্য পুরস্কার ব্যবহার করা যায়। পুরস্কার হলো এমন কিছু যা শিশু পছন্দ করে। যেমন খাবার, মনোযোগ, প্রশংসা, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, পছন্দের কিছু কিনে দেওয়া ইত্যাদি।

- কোন একটি কাজ করার পর যদি পুরস্কার দেওয়া হয় তাহলে শিশু আবার ঐ কাজটি করে। যেমন অনেক শিশু টয়লেট কিংবা দাঁত ব্রাশ কীভাবে করতে হয় তা বুঝতে পারে না। এপর্যায়ে রুটিন অনুযায়ী শিশুর জন্য প্রশিক্ষণ শুরু করুন। তাহলে দেখা যাবে, শিশুটি এক পর্যায়ে আচরণটি করছে। এবং ঠিক যখন সঠিক আচরণটি শিশু করবে তখনই তাকে পুরস্কার দিন। এক্ষেত্রে শিশুকে উৎসাহিত করুন যাতে সে বুঝতে পারে যে সে একটি ভালো কাজ করেছে।
- সঠিক কাজটি করার সাথে সাথে পুরস্কার দিন। তা না দিলে সেই কাজটি আবার করার সম্ভাবনা কমে যায়।
- যে আচরণটির জন্য পুরস্কার দেওয়া হলো সে আচরণটি যেন শিশু আবার করে সে দিকে লক্ষ রাখুন। শিশু যেসব ছোট ছোট কাজ করতে পারে সেগুলোকে উৎসাহ দিন।
- কোন আচরণ/কাজ শেখানোর ক্ষেত্রে প্রথমে পুরস্কার খুব ঘনঘন দিন। কাজ শেখা হয়ে গেলে, প্রতিবার তা দেওয়ার দরকার নেই। এক্ষেত্রে মাঝেমাঝে পুরস্কার দিন।
- প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেওয়া হলে, তার চাহিদা শিশুর কাছে থাকে না। যেমন প্রথমেই শিশুকে ৪/৫টি চকলেট না দিয়ে অল্প করে দিন। এতে শিশু পুরস্কার পাওয়ার জন্য আবার সঠিক আচরণটি করবে।
- বকা দেওয়া, মারধোর করাও কিছু শিশুর কাছে এক ধরনের পুরস্কার। সেজন্য যদি শিশু বিরক্তিকর আচরণ করে এবং যদি বাবা-মা ঐ আচরণের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে এড়িয়ে যায় তাহলে শিশু আস্তে আস্তে ঐ আচরণ আর করবে না।

ঙ) অভিনয় করে দেখানো: কোন কাজ কীভাবে করতে হবে তা নিজে অভিনয় করে শিশুকে দেখিয়ে দিন। শিশুরা তার বাবা-মা/অন্যকে কোন কাজ যেভাবে করতে দেখে ঠিক সেভাবেই নিজে চেষ্টা করে। যেমন কীভাবে পানির গ্লাস ধরতে হবে তা নিজে করে শিশুকে দেখিয়ে দেওয়া।

চ) পার্থক্যকরণ: শিশুকে যখন বিভিন্ন জিনিস চেনানো হয় এবং যখন শিশু অনেকগুলো বস্তুর মধ্য থেকে নির্দেশনামতো কোন বস্তু চিহ্নিত করতে পারে ও তা তুলে আনতে পারে তখন বুঝতে হবে, শিশু পার্থক্য করতে শিখছে। যেমন বল ও আপেলের মধ্যে "বলটি আনো" বললে "বলটি" চিহ্নিত করা এবং তা নিয়ে দেখানো। এভাবে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখান এবং সেটা বারবার অভ্যাস করান।

ছ) বাধা দান করা: এই শিশুদের কোন বস্তু চিনতে শেখানোর পর যখন তাকে আরেকটি নতুন বস্তু চিনতে শেখানো হয় তখন তারা প্রায়ই ভুল করে। এক্ষেত্রে শিশুকে সঠিক বিষয়টি শেখানোর জন্য কোন কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, যেমন শিশুকে পুরস্কার দিয়ে "কলম" চেনানো হলো; এবার একইভাবে তাকে "বই" চেনানো হলো। একটি বস্তু চেনার পর সে ঠিকভাবে দুটি বস্তু চিনতে পেরেছে কিনা, তা জানার জন্য "বই ও কলম" পাশাপাশি রেখে শুধু "কলম" তুলে আনতে বলা হলো। যদি শিশু ঠিকমতো নির্দিষ্ট জিনিসটি তুলে আনতে পারে তাহলে বোঝা যাবে যে সে "বই ও কলম" দুটি বস্তুই চিনতে পারে। যদি সে ভুল করে "কলম"-এর জায়গায় "বই" তুলে নিয়ে আসে তাহলে বোঝা যাবে, সে দুটি বস্তু আলাদাভাবে চিনতে পারেনি। এক্ষেত্রে শিশু "কলম" না তুলে যখনই

"বই"-এর দিকে হাত বাড়াবে তখন তাকে "বই" ধরার আগে বাধা দিন। বাধা দেওয়ার ফলে শিশু রেগে যেতে পারে। তারপরও তাকে একই জিনিস আনার জন্য আবার নির্দেশ দিন। এখানে নির্দেশমতো কাজ না করার কারণে, শিশু যে ভুল আচরণ করতে যাচ্ছিল সেটাকে বাধা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যদি তার শেখানো বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে সে শিখবে যে রাগ করলে আর কাজটি করতে হবে না। অনেকগুলো বস্তুর মধ্যে পার্থক্যকরণ শেখানোর জন্য এই বাধাদান খুবই কার্যকর কৌশল।

জ) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দক্ষতার ব্যবহার: অনেক শিশুর ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা যায়, তা হলো কোন পরিস্থিতিতে একটি দক্ষতা শেখানো হলে তা একইরকম অন্য পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারে না। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই দক্ষতা ব্যবহার করার জন্য:

- শিশুকে উৎসাহিত করুন এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নতুন দক্ষতা ব্যবহার করার নির্দেশ দিন।
- শিশুকে পুরস্কার দিন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শেখানো দক্ষতা ব্যবহার করতে পারে।

উপরোক্ত কৌশলগুলো যেটি শিশুর জন্য প্রযোজ্য তা বুঝে প্রয়োগ করুন।

শিশুর দক্ষতা উন্নয়নে অভিভাবকের করণীয়

সামাজিক বিকাশের জন্য করণীয়

শিশুর অন্যান্য সামাজিক আচরণ, যেমন হাসির জওয়াবে হাসতে পারা, সালাম করা, করমর্দন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, স্পর্শ দ্বারা বন্ধুত্ব করা ইত্যাদি দক্ষতাগুলোও উপরোক্ত কৌশলগুলো প্রয়োগ করে শেখান। এছাড়াও:

- শিশুকে সকল ধরনের সামাজিক পরিবেশে নিয়ে যান। যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাসায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে, খেলার মাঠে, পার্কে, শপিং-এ ইত্যাদি। এই ধরনের পরিবেশের সাথে শিশুকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করুন। শিশুকে সকল ধরনের সহযোগিতা ও সমর্থন দিন এবং অন্যের বিরূপ সমালোচনা ও আচরণ থেকে রক্ষা করুন।
- শিশুর সাথে নিজেরা নিয়ম করে খেলবেন। যেমন বল ছোঁড়া ও ধরা, লুকোচুরি খেলা ইত্যাদি।
- সমবয়সীদের সাথে মিশতে দিন এবং খেলার মাঠে সবার সাথে খেলার জন্য শিশুকে উৎসাহিত করুন।
- খেলার মাঠে, পার্কে ঘুরতে নিয়ে যান ও সহজভাবে চলাফেরা করতে দিন। কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেলে এবং আত্মীয়-স্বজন বিরক্ত হলে, শিশুর সমস্যার ব্যাপারে খোলামেলা হোন। তাহলে সব অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠা যাবে।

আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশের জন্য করণীয়

- শিশুর বয়স ও বুদ্ধি অনুযায়ী যেসব দক্ষতা এখনো শিখতে পারেনি সেগুলোই হবে শেখানোর বিষয়। যেমন যথাস্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা, নিজ হাতে খাওয়া, হাত-মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, গোসল করা, চুল আঁচড়ানো, জামা-জুতা পরা, পেনসিল-কলম দিয়ে লেখা ইত্যাদি।
- কাজগুলো ছোট ছোট ভাগ করে শেখান। শিশু কোন কাজ শুরু করতে না চাইলে, তাকে তার কাজ পছন্দ করার সুযোগ দিন এবং তার পছন্দ অনুযায়ী কাজগুলো শেখান।
- শিশুর পছন্দ ও অপছন্দকে হ্যাঁ/না বলে বা ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করতে শেখান।
- কোন কিছু শেখার ক্ষেত্রে শিশু যদি সঠিক কাজটি করতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার দিন এবং যদি শিশু চেষ্টা করে তাহলেও তাকে চেষ্টা করার জন্য পুরস্কার দিন।

ভাষার বিকাশের জন্য করণীয়

১. যদি শিশুর ভাষাজ্ঞান খুব কম থাকে তাহলে তার সাথে বেশি বেশি কথা বলুন, যাতে ভাষার উন্নতি হয়। এক্ষেত্রে:

ক) প্রতিদিন রুটিন করে শেখানো কথাগুলো বারবার বলানোর অভ্যাস করুন ও তাকে নতুন শব্দ শেখানোর চেষ্টা করুন।

খ) শিশু অস্পষ্টভাবে কোন শব্দ উচ্চারণ করলে তাকে সম্পূর্ণ শব্দে পরিণত করতে সাহায্য করুন।

গ) শিশুকে আপনার চোখের দিকে তাকাতে ও ঠোঁটের নাড়াচাড়া অনুসরণ করতে সাহায্য করুন।

ঘ) প্রাথমিকভাবে দরকারি সহজ ও ছোট শব্দ শেখান। সেগুলো স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে শেখান।

২. যেসব শিশুর ক্ষেত্রে একেবারেই ভাষার বিকাশ অনুপস্থিত সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি চর্চা করানো যেতে পারে:

- আমরা মনের কথা ও প্রয়োজন বুঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করি; সাথে অনেক ধরনের অঙ্গভঙ্গিও করি, যেমন চোখের ইশারা, মাথা নাড়ানো, হাত দিয়ে নির্দেশ করা, মুখ গোমড়া করা বা মুখ হাসিহাসি রাখা ইত্যাদি। এই অঙ্গভঙ্গিও আমাদের মনের ভাব প্রকাশের এক ধরনের ভাষা। তাই শিশুকে ইশারা, ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখান ও উৎসাহিত করুন।

৩. যেসব শিশুর ভাষার যথাযথদক্ষতা রয়েছে কিন্তু বাসায় বা সামাজিক পরিবেশে ব্যবহার করতে চায় না সেক্ষেত্রে:

- অভিনয় করে দেখান, উৎসাহ দিন ও পুরস্কার ব্যবহার করুন, যাতে শিশু সামাজিক পরিবেশে তার ভাষা ব্যবহার করতে পারে। যেমন একজন বিস্কিট বলতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় বিস্কিট চাইছে না। এক্ষেত্রে যখন সে নিজের মুখে বিস্কিট চাইবে তখনই তাকে বিস্কিট দিন, তার আগে নয়। এভাবে করলে শিশু তার প্রয়োজন ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে শিখবে।

৪. ছবির বই, জিনিসপত্র দেখিয়ে কথা শেখান। শিশুকে অক্ষর ও ছড়াগানের ক্যাসেট শোনাতে পারেন।

৫. শিশুর ভাষাজ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, তার চারপাশের জিনিসপত্রগুলোর নাম তাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে।

জেদি আচরণ এবং নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা

এই শিশুদের অনেকেই পরিবেশের পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। যদি কেউ পরিবারের সুবিধার জন্য বা শিশুর সুবিধার জন্য রুটিন বা অভ্যাসের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে চায় তাহলে কখনো কখনো এসব শিশু হতাশ হয়, ভয় পায় বা খুব রাগান্বিত হয়ে উঠে। তারা বুঝতেই পারে না, তাদের এই আচরণ অন্যদের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলবে।

হতাশ হয়ে পড়লে বা রেগে গেলে শিশু ভাংচুর করতে পারে, নিজেকে আঘাত করতে পারে, যেমন দেওয়ালে মাথা ঠুকা, চুল টেনে তুলে ফেলা, নিজের হাত কামড়ানো ইত্যাদি। নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা কিছু

শিশুর ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক হয়। তবে কিছু শিশু অনেক বেশি বয়সে অন্যের ইশারা কিছুটা বুঝতে পারে এবং তখন কিছুটা হলেও তাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়।

- এসব আচরণের ক্ষেত্রে কীভাবে আচরণগুলো ঘটছে, যেমন ঘটনা-আচরণ-ফলাফল বিশ্লেষণ করুন। প্রয়োজনে এগুলি লিখে রাখুন ও চিকিৎসক-পরামর্শককে দেখিয়ে সাহায্য নিন।
- কোন শব্দ, আলো, গন্ধ ইত্যাদির প্রতি অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া (কানে হাত দিয়ে রাখা, চোখ বন্ধ করে ফেলা, চিৎকার করা ইত্যাদি) করলে শিশুকে ঐ ধরনের পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন।
- শিশুর ভুল কাজ ও অযৌক্তিক আচরণ সমর্থন করবেন না। জেদি আচরণ বন্ধ করলে পুনরায় শিশুর দিকে মনোযোগ দিন।
- শিশুর সাথে কোনরকম বকাবকা, ভয় দেখানো, মারধর বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না।
- পরিবেশের কোন পরিবর্তনে যদি শিশু আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে তাহলে প্রশিক্ষণ ও পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে ঐ পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হতে শেখান।

অতিচাঞ্চল্য

এই শিশুদের যেহেতু সামাজিক যোগাযোগ ও আচরণগত সমস্যা থাকে তাই সাধারণ মানুষের মতো তারা অন্যদের সাথে মিশতে ও খেলতে পারে না। একারণে তাদের শক্তি খুব কম ক্ষয় হয়। এসব কারণেও তাদের মধ্যে অতিরিক্ত চাঞ্চল্য দেখা যায়। তাই শিশুকে বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে শান্ত হতে শেখান, যেমন গান শোনা, সাঁতার কাটা, টিভি দেখা, বিভিন্ন খেলনা দিয়ে খেলা ইত্যাদি। তেমনই, পাশাপাশি অবসর কাটানোর প্রক্রিয়াও শেখান। সাথে সাথে তাদের খাদ্যতালিকাও তৈরি করুন। যাদের মধ্যে অতিরিক্ত চাঞ্চল্য আছে তাদের খাদ্য তালিকায় বেশি শক্তিযুক্ত খাবার, যেমন ফাস্টফুড, চিপস, জুস, কোল্ড ড্রিংকস, তেলেভাজা খাবার ইত্যাদির, আধিক্য লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে এসব নিয়ন্ত্রণ করে বাসায় তৈরি স্বাভাবিক ও সুষম খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করুন। যদি শিশুর মধ্যে খুব বেশি চাঞ্চল্য দেখা যায় তাহলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

বিনোদনমূলক কাজের প্রশিক্ষণ

- কিছু শিশু রয়েছে যারা সবসময় বাইরে বেড়াতে যেতে চায়, এজন্য জেদ এবং অপ্রত্যাশিত আচরণ করে। এসব শিশুকে বাসায় টিভি দেখতে দিন, গান শুনতে, ছবি আঁকতে ও তার পছন্দের কোন কাজ করতে উৎসাহ দিন।
- কিছু শিশু রয়েছে যারা সারাক্ষণ টিভি দেখতে চায় এবং অন্যান্য কাজ করতে চায় না বা বাইরে যেতে চায় না। তাদের বাইরে বেড়াতে যেতে উৎসাহিত করুন।

বিশেষ দক্ষতা

এই শিশুদের মধ্যে অনেককেই কোন কিছুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে দেখা যায়, যেমন খেলনা বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস খুলতে পারা, কোন কিছু চট করে মুখস্থ করার ক্ষমতা ইত্যাদি। শিশুর এসব আচরণকে দক্ষতা হিসেবে দেখুন এবং প্রশিক্ষণ ও সমর্থন দিয়ে এসব দক্ষতাকে কাজে লাগান। যেমন যাদের ছবি আঁকা বা ছবি দেখার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ আছে তাদেরকে ছবির মাধ্যমে নতুন কিছু শেখানো যায়। আবার যদি কারও খেলনার (যেমন পুতুল, গাড়ি ইত্যাদি) প্রতি আগ্রহ থাকে তাহলে সেটা অংক শেখা বা ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করুন। যেমন ২/৩টা পুতুল একসাথে করে জিজ্ঞেস করা, এখানে কয়টা পুতুল রয়েছে ইত্যাদি।

শিশুরা কতটুকু কাজকর্ম করতে পারবে

অটিজম রোগটি মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। বিদেশি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১,০০০ জনের মধ্যে ৬ জনের অটিজম রয়েছে (ঘবংিপযধভভবব বঃ ধষ. ২০০৭)। বাংলাদেশে ৩,৫৬৪ জন শিশুর উপর একটি গবেষণায় দেখা যায়, ০.৮% শিশুর অটিজম রয়েছে (Rabbani MG et al. 2009)। বিদেশি আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে ৪% অটিস্টিক শিশু সাধারণ মানুষের মতো কাজকর্ম করতে পারে।

১। যেসব শিশুর অল্পমাত্রার অটিজম রয়েছে তাদেরকে নিজের কাজ করতে শেখালে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে।

২। যাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা রয়েছে তারা কিছুটা অন্যের সাহায্য নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করতে পারবে। যেমন কম্পিউটারে তথ্য প্রবেশ করানো, বিক্রয়কর্মী, ফ্যাক্টরির কাজ, ছোটখাট ব্যবসা ইত্যাদি কাজ করতে পারবে।

৩। যাদের বুদ্ধিমত্তা কম তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য নিয়েও কাজ করতে পারে না। তাদেরকে শুধুমাত্র নিজের কাজগুলো করার প্রশিক্ষণ দিন।

৪। লেখাপড়াটা বুদ্ধিমত্তা এবং যোগাযোগের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। তাই স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা থাকলেও, যাদের যোগাযোগের দক্ষতা কম, তারা বেশিদূর পর্যন্ত পড়তে পারে না।

৫। যাদের অটিজমের মাত্রা মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে তারা কিছুটা অন্যের সাহায্য নিয়ে নিজের কাজ করতে পারে।

৬। যাদের অটিজমের মাত্রা গুরুতর পর্যায়ে রয়েছে তাদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

৭। প্রতিভাবান বা বিশেষ মেধাসম্পন্ন বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা তাদের পছন্দের বিষয়ে অনেক দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যেমন ছবি আঁকা, অংক শাস্ত্র ইত্যাদি।

শিশুকে উপরোক্ত বিষয়গুলো শেখানোর সাধারণ কিছু নিয়ম

- শেখানোর সময় দীর্ঘ না হয়ে অল্প হওয়া ভালো। শিশুদের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ মিনিট সময় যথেষ্ট। এরপর ধীরে ধীরে শেখানোর সময় বাড়ানো যেতে পারে।
- শেখানোর সময় এমন বিষয় বাছাই করবেন এবং এমনভাবে চেষ্টা করবেন যাতে শিশু সেটা করতে সফল হয়।
- একসাথে অনেকগুলো বিষয় শেখানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।
- শেখানোর সময় শিশুর আগ্রহ, ইচ্ছা ও পছন্দকে গুরুত্ব দিন, ইতিবাচক মনোভাব দেখান। শিশুর ব্যর্থতার জন্য ধৈর্য্য হারাবেন না।
- শেখানোর সময় বাড়ির নির্দিষ্ট কিছু স্থানে শিশুর পছন্দনীয় পরিবেশ বজায় রাখুন।
- শিশুকে শেখানোর সময় তার সম্পর্কে লিখে রাখুন। এতে বোঝা যাবে শিশু কতটুকু শিখতে পারছে।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগের চিকিৎসা

- অটিস্টিক শিশুদের কারও-কারও মধ্যে একইসাথে অন্যান্য রোগ, যেমন মানসিক প্রতিবন্ধকতা, খিঁচুনি, মৃগী ইত্যাদি, দেখা যায়। সেকারণে এসব শিশুর জীবন আরও কঠিন হয়ে উঠে। এই সমস্যাগুলো থাকলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতো এই শিশুরা নিজেদের অসুখ-বিসুখের কথা বলতে পারে না। সেজন্য শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন। তেমন কোন অসুখের লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

অভিভাবকের নিজের জন্য করণীয়

১। অভিভাবকরা পরিবার এবং শিশুকে নিয়ে বেশ মানসিক চাপে থাকেন।তাই নিজের যত্ন নিন এবং নিজের জন্য কিছুটা সময় রাখুন।প্রয়োজনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে কথা বলুন এবং তাদের সহযোগিতা গ্রহন করুন।

২। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বোধ করলে শীথিলকরণ/আরামকরণ/রিলাক্স পদ্ধতি ব্যবহার করুন। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

ক) নিজের রুমে অথবা শান্ত পরিবেশে আরাম করে বসুন।

খ) ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করুন। আপনার নিঃশ্বাসটাকে অনুভব করার চেষ্টা করুন।

গ) লম্বা করে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিন (৪-৫ সেকেন্ড সময় ধরে)। নিঃশ্বাসটা কিছুক্ষণ (৫ সেকেন্ড সময় ধরে) বুকের মধ্যে ধরে রাখুন। এরপর আস্তে আস্তে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিন (৭-১০ সেকেন্ড সময় ধরে)।

ঘ) নিঃশ্বাস ছাড়ার সাথে সাথে মনে মনে বলতে থাকুন, "আমার ভিতরের সব ক্লান্তি, দুঃখ, কষ্ট বের হয়ে যাচ্ছে। আমি আরাম বোধ করছি।" এসময় শরীরকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিন এবং নিঃশ্বাসের প্রতি মনোযোগ দিন।

এর মাধ্যমে মন ও শরীরে আরাম বোধ করবেন। এছাড়াও মন খারাপ, মাথা ব্যথা, অনিদ্রা, খারাপ কোন কিছু ঘটার দুশ্চিন্তা, মনোযোগে সমস্যা কমানোর জন্য এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

৩। অন্যান্য যেসব পরিবারের শিশুর অটিজম বা এই ধরনের অন্য কোন সমস্যা রয়েছে তাদের সাথে কথা বলুন। তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন, যা আপনার মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে।

৪। নিজে অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অতিরিক্ত মানসিক চাপ বোধ করলে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং অথবা পারিবারিক কাউন্সেলিং গ্রহণ করুন।

৫। স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় অটিস্টিক শিশুদের নতুন আচরণ শিখতে অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই "শিশু কেন আরো ভালো করছে না"-- এটা চিন্তা করে ভুল, শিক্ষক কিংবা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না। বরং নির্দিষ্ট বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন।

শেষ কথা

শিশুর যতদ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যাবে ততো ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। একই সঙ্গে মানসিক ও সামাজিক সহযোগিতা জরুরি। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও শিশুর আচরণকে সহজভাবে গ্রহণ করুন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক শিশুই নতুন আচরণ যেমন শেখে তেমনি তাদের মধ্যে নতুন সমস্যাজনক আচরণও দেখা যায়। শিশুর আচরণ পরিবর্তনের জন্য যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তার উপর নির্ভর করে শিশুর আচরণ কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। শিশুকে শেখানোর ক্ষেত্রে বাবা-মা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাদের সঙ্গে সবসময় গঠনমূলক ও সহানুভূতিশীল আচরণ করুন। শিশুর জন্য স্নেহ-মমতাময় পরিবেশ গড়ে তুলুন। কুসংস্কার, ভুল ও অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে দূরে থাকুন, সঠিক তথ্য জানুন এবং তার যথার্থ প্রয়োগের চেষ্টা করুন।

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও
প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়